OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 309 - 319
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 309 - 319
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘বাঙালি নারীদের বৈধব্যের যন্ত্রণা’ : উপন্যাসের একটি চর্চিত ধারা

বৈশাখী দাস
গবেষক, ও পি জে এস ইউনিভার্সিটি
Email ID: Baishakhid32@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Widowhood, Society, Obstacle, Women’s liberation.

Abstract
Various practices and events centered on women’s lives are an important topic of study in the history of literature. Various issues such as women’s freedom dowry system, child marriage, etc. Come up in the beginning of the topic. One such topic that has been studied is the pain of widowhood among Bengali women, which has existed from traditional ancient times to modern’s times. In the Bengali Novel genre, the theme of widowed women is portrayed through various characters. In the works of Bankimchandra, Sharatchandra, Rabindranath Tagore, Tarashankar, Manik Bandyopadhay, widowed women have sometimes been stigmatized by society, and sometimes have resorted to hard work to fulfill their unfulfilled desires, leading to tragic consequences. When did those women become the head of families, they lead their lives in an independent minded manner, on a firm path of justice and truth. Although each of these characters had different paths, their lives were not filled with the pain of not getting anything, but with the desire to establish themselves as human beings in society. Although Vidyasagar Mahasayas widow remarriage was in accordance with the law, it was not fully accepted by society. Marriage at young age, them the death of the husband, and in the later stages, becoming a kind of dying person in the guise of a widow, was the real truth of the lives of the girls of that time. Which was sometimes revealed in a trams parent and sometimes opaque form in the movement of the writer’s pen. In the history of women’s liberation, the pain of widowhood was the biggest obstacle for Bengali women to establish themselves as women.

Discussion

ভূমিকা : এই বিশ্ব সংসারে বিশ্ববিধাতা সৃষ্টি করেছেন দুটি শব্দ কেবলমাত্র – নারী ও পুরুষ। সমাজ ও শিক্ষার ধারা বিকাশের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই দুটি শব্দ ছিল লিঙ্গ ও আকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সমাজ ব্যবস্থার মজ্জায় ধীরে ধীরে এই দুটি শব্দের নামোল্লেখ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত হতে লাগল। সমাজে তার ইচ্ছানুযায়ী ‘নারী’ শব্দের বিষয়টিকে ক্রমশ পরিবর্তিত ও বিবর্তিত করতে থাকে। যেখানে ‘পুরুষ’ শব্দটি তার গরিমা এবং অহমিকা অনুযায়ী একই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 309 - 319
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্থানে রইল। নারীকে কখনো গৌরী, কখনো মা, কখনো বিবাহিতা আবার কখনো বিধবা, বেশ্যা, অপয়া অলক্ষ্মী, সতীন নামেও পর্যবসিত করা হল। নারীর নামের পাশে এসব সমাজ নামাঙ্কিত পদবীতে নারীরা বারবার ভেঙেছে, সয়েছে নানা যন্ত্রণা, আবার কখনো প্রতিবাদের ধ্বনিতে নারীরা হয়েছে সোচ্চার ও সরব। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত সমাজ আজ পাড়ি দিয়েছে অনেক দূরে, ছুঁয়েছে আকাশ, জল ও মাটির অন্তরীক্ষে যেমন আবিষ্কার করেছে নানা তথ্য, তেমনি মহাজাগতিক অনামি তারাদের পেছনে ছুটেছে নতুন কিছু প্রতিস্থাপিত করার জন্য। বলা যায়, মানুষ পুরো বিশ্বকে নিজ মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে। তবে একটা বিষয়ে সমাজ এখনও পিছিয়ে কিংবা এগোতে চায় না। তা হল নারীকেন্দ্রিক চর্চা বা সমস্যা। নারীকে ভূলুণ্ঠিত, কলুষিত করার ক্ষেত্রে সমাজ যে নিশ্চুপ, নারীরা আজ অনেক এগিয়ে, নিজ সম্মানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে তারা তৎপর। অনেকক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত, কিন্তু এখনো কিছু কিছু কুসংস্কার নারীর এগিয়ে চলার পথকে করেছে রুদ্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র, বিবেকানন্দ, কাজী নজরুলের পুণ্যভূমিতে নারীরা আজও কেবল শব্দমাত্র। নারীর জীবনধারা চক্রে রয়েছে বাবা মা, স্বামী কিংবা সন্তানের উপর নির্ভরশীলতা। একটি কন্যার জন্ম থেকে শুরু করে পিত্রালয়ে বেড়ে ওঠা, শ্বশুরালয়ে গমন, স্বামীর অবর্তমানে বৈধব্যের যন্ত্রণা, শেষ বয়সে সন্তানের কাছে অপারগ, অব্যবহার্য বস্তু হিসেবে মৃত্যুর অপেক্ষা করা, যা সমাজ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে চলে আসছে।

নারী জীবনে সবচেয়ে দুর্বিষহ সময় হল বৈধব্য দশা। বৈধব্য যা বিধবা শব্দের নামান্তর। 'বিধবা' শব্দটি ঋগবেদে অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে মরুৎরা যখন নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে পাহাড় পর্বত কাঁপিয়ে তোলে, তখন পৃথিবীর অবস্থা ছিল বিধবার মতো কম্পিত। অনেকের মতে বিধবা শব্দটি থেকে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে ভয় বা ভীতি। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে বিধবা নারীদের কম্পিত ও ভীত হয়ে থাকা সমাজের নানান চাপ ও সংস্কারের বেড়াজালে।

> "আমাদের দুই মহাকাব্যেই কিন্তু বৈধব্যকে অমঙ্গলকর মনে করা হয়েছে। বলা হয়েছে, স্ত্রীদের জন্যে বৈধব্যের চেয়ে অমঙ্গলের আর কিছু হয় না। বৈধব্যই নারীর জীবনে সবচেয়ে ভয়াবহ সংকট – ভয়ানামপি সর্বৈষাং বৈধব্যং ব্যসনং মহৎ। ধর্মজ্ঞেরা মনে করেন, যে পুত্রবতী স্ত্রী স্বামীর আগেই মারা যায়, সে পরম সৌভাগ্যবতী। অমঙ্গলকারী যা কিছু রয়েছে, তাদের মধ্যে বিধবাই সবচেয়ে অমঙ্গলের – অমঙ্গলেভ্যঃ সর্বেভ্যো বিধবা স্যাৎ অমঙ্গলা। বিধবা দেখলে কোনো কাজে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয় – বিধবা দর্শনাৎ সিদ্ধিঃ ক্বাপি তুন জায়তে। কেবলমাত্র মা ছাড়া আর সব বিধবাই অলক্ষুণে। বিচক্ষণ লোক সাপের বিষের মতো বিধবার আশীর্বাদও এড়িয়ে চলেন।"[১]

মহাভারতে আমরা উল্লেখ পাই স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন নারীর বেঁচে থাকার অর্থ নরকবাসের যন্ত্রণা। নারীদের এই অসীম যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবন প্রথম যার মনকে আন্দোলিত করেছিল তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে,

> "বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতিবিয়োগে দুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়।"[২]

মহাভারতে বিধবার মরণ-এর দুটি রূপ ছিল, এক সহমরণ দুই অনুমরণ। সহমরণ যা মৃত স্বামীর সঙ্গেই তার চিতায় নিজেকে পুড়িয়ে মারা আর অনুমরণ হল স্বামীর শেষ কৃত্যের কিছুকাল পরে চিতার আগুনে কিংবা জলে ডুবে নারীর প্রাণ দেওয়া, আমরা দেখেছি মহাভারতে, পাণ্ডুর মৃত্যুতে মাদ্রী সহমরণে গেছেন পাণ্ডুর সাথে। মাদ্রী "কুন্তীকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর শরীর এবং পাণ্ডুর মৃতদেহ একসঙ্গে বেঁধে যেন চিতায় তোলা হয়। ভাবটা এই যে, সতী নারী মৃত্যুতেও স্বামীর সঙ্গ ছাড়ে না। এবং একই সঙ্গে এও আশা করত যে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়ে চিতায় উঠলে স্বর্গেও স্বামী-সোহাগী হবে।"[৩] অন্যদিকে মহাভারতের অন্যান্য চরিত্র সত্যবতী, কুন্তী, উত্তরা সহমৃতা না হয়ে বিধবার জীবন কাটিয়েছে। প্রাচীন সময়ে নারীদের ন্যূনতম জীবনযাপনের জন্যে নির্ভর করতে হতো অন্যের উপর, বিবাহিত নারীর 'পুরুষ' অর্থাৎ স্বামী থাকতেও যন্ত্রণার যেমন শেষ ছিল না, আর স্বামী না থাকলেও যন্ত্রণা কোনো অংশে কমতনা, বরং বেড়ে যেত। বাংলার অমর কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিধবার দুঃখে দুঃখিত হয়ে বলেছেন –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 309 - 319
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ঐ রে।
না হলে এমন দশা নারী আর কই রে।।"

> "বাস্তবিকই বঙ্গ বিধবার দশা দেখিয়া, এমন কে পাষণ্ড আছে যাহার অশ্রুপাত না হয়? আজি বঙ্গ দেশের এরূপ দুরবস্থা হইবার প্রধান কারণ কী? বঙ্গ – বিধবাগণকে পীড়ন করা কি ইহার অন্যতম কারণ নহে?"[৪]

নারী বিশেষত বঙ্গ রমণীর বৈধব্য যন্ত্রণা যা বিধবার পরবর্তী জীবনে মানসিক, সামাজিক, শারীরিক নানা যন্ত্রণাদগ্ধ কাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারায়। উপন্যাসিকেরা তাঁদের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলিকে যেমন শাঁখা সিঁদুরে রাঙিয়েছেন আবার অন্যদিকে তাদেরই পরিয়েছেন সাদা থানের নগ্ন অসহায় ক্লিষ্ট জীবনগাঁথা। বাংলা সাহিত্যে নারীর 'বিধবা' চরিত্রটি কোনও ক্ষেত্রে রূঢ়, হিংস্র আবার কোনও ক্ষেত্রে মমতাময়ী রূপে ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট নানা চরিত্রের মধ্যে নারীকে তিনি নানা রূপে প্রতিভাসিত করেছেন পাঠকের কাছে। তার মধ্যে অন্যতম নারীর বৈধব্য দশাগ্রস্ত জীবনযাপনে তিনি দিয়েছেন এক অনন্যমাত্রা। তাঁর উল্লেখ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে রোহিণী নামক এই দুটি চরিত্রের ধারাকে একটু অন্যভাবে সাজিয়েছেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে 'কুন্দনন্দিনী' চরিত্রটি অনাথিনী, বিধবা, সুশীলা এবং সর্বগুণসম্পন্না। কুন্দকে বঙ্কিমচন্দ্র অপরূপ রূপে সুসজ্জিতা করেছেন ঠিকই কিন্তু তার ললাটে লিখেছেন দুঃখের ঘোর নিশা। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় তার দুঃখের সূচনার রূপ—

> "এই গভীর অনিবার্য যন্ত্রণা মুমূর্ষুর প্রতি নিঃশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছিল। অবিরল মুদ্রিত মুখনেত্রে বারিধারা পড়িতেছিল। আর শিরোদেশে প্রস্তরময়ী মূর্তির ন্যায় সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা স্থিরদৃষ্টে মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন পিতৃমুখপ্রতি চাহিয়াছিল।"[৫]

এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা পিতার মৃত্যুর পর হল অনাথ গৃহহারা। রচনার পরবর্তী পর্যায়ে তার কপালে সুখের একটি ক্ষীণ আলো দেখা গেল। যখন সূর্যমুখী তারাচরণের সাথে কুন্দনন্দিনীর বিবাহ স্থির করিলেন, কিন্তু বঙ্কিমবাবু এই ঈষৎ সুখ কুন্দর কপালে বেশিক্ষণ স্থায়ী করতে দিলেন না।

> "কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র বাটি লইয়া আসিলে তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। তারাচরণ সুন্দরী স্ত্রী ঘরে লইয়া গেলেন। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী লইয়া তিনি এক বিপদে পড়িলেন।"[৬]

পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা গেল বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে তার বিবাহের তিন বৎসর পর বিধবার দশায় উপস্থিত করালেন।

> "বিবাহের পর তিন বৎসর কাল কাটিল। তাহার পর – কুন্দনন্দিনী বিধবা হইলেন।"[৭]

এখান থেকে বঙ্কিমবাবু কুন্দনন্দিনীর চরিত্রটিকে অন্যভাবে প্রতিস্থাপিত করালেন। এখান থেকে তিনি কুন্দকে উপন্যাসের এক খল বিধবা নায়িকা হিসেবে সৃজন করলেন, যেখানে নগেন্দ্রর মতো সংযমী পুরুষ তাকে দেখে তাররূপে মোহিত হয়েছিলেন। সূর্যমুখী যে কুন্দকে এত ভালোবাসতো সে তার স্বামী নগেন্দ্রর সাথে কুন্দর বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। সেই সময় কুন্দর মুখে বঙ্কিম কোনো ভাষা দেয়নি। কিন্তু কুন্দর মনে চলতে থাকা নানা মানসিক টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্ব যেন কোথাও সমাজের চাপে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ—

> "কুন্দনন্দিনী অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল – বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল।"[৮]

এই উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী ভাগ্যবঞ্চিতা অকালপুষ্পের মতো সামাজিক প্রতিকূলতায় অকালে ঝরে পড়া এক অনাথ বিধবা। সুখ যে তার জীবনে সয় না। তার জীবন ছিল ট্রাজেডি, অকালমৃত্যু এক সামাজিক প্রতিকূলতায় পূর্ণ। তার জীবনে ছিল না কোনো স্বাধীনতা না ছিল স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, সূর্যমুখীর অনুরোধে নগেন্দ্রর স্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেলেও তার বাস্তবরূপ সুখকর হয়নি। নগেন্দ্রর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল এক জটিল ও বিড়ম্বনাময় প্রেমের, তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সামাজিক ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব তার স্বপ্নকে চিরদিনের জন্যে শেষ করে দেয়, কুন্দের এই ট্রাজেডিময় জীবন বঙ্কিমচন্দ্র তার মুখে দিয়েছেন ভাষা—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 309 - 319
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আমি সকল ভুলিয়া গিয়াছি – আমি কেন ভুলিলাম? মা আমাকে দেখা দিয়েছিলেন – মা আমার কপালের লিখন জানিতে পারিয়া আমায় ঐ নক্ষত্রলোকে যাইতে বলিয়াছিলেন – আমি কেন তাঁর কথা শুনলেম না – আমি কেন গেলাম না! – আমি কেন মানলেম না! আমি এখনও বিলম্ব করিতেছি কেন? আমি এখনও মরিতেছি না কেন? আমি এখনই মরিব।"[৯]

বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে এক ট্র্যাজিক চরিত্র হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। এই উপন্যাসের পটভূমি বিধবাবিবাহ আইন পাশ হওয়ার সমসাময়িক কাল। অনেকের মতে, উপন্যাসের নায়িকা বিধবা কুন্দনন্দিনীর চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের কন্যা অবলম্বনে রচিত বলে মনে করা হয়। পুরো উপন্যাস জুড়ে কুন্দনন্দিনীর এক জীবনব্যাপী দুঃখ যা তার ট্র্যাজিক মৃত্যুতে যবনিকাপাত ঘটায়। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় যে, "কুন্দ বিষপান করিয়াছে।"[১০] এখানে বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনীকে আলো আঁধারির সন্নিবেশ চিত্রায়িত করেছেন। উপন্যাসের শেষে কুন্দর বিষপান একাধারে পাঠককুলের সামনে উদ্ভাসিত করেছে কুন্দর খল চরিত্রের দিক। কিন্তু আদপে তার চরিত্রটি একটু গভীর যেখানে একটি নারীর কেবল না পাওয়া, অসহায়তা, সবকিছু পেয়েও জীবনের শূন্যতা এক করুণাত্মক কাহিনী বিদ্যমান।

> "আমার সাধ মিটিল না – আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে – আমার মুখ শুকাইতেছে – জিব টানিতেছে – আমার আর বিলম্ব নাই।"[১১]

বঙ্কিমবাবু এক নারী (কুন্দ চরিত্র)কে এক সর্বহারার শীর্ষে বসিয়েছেন। বিধবা নারীর সমাজে কী দুর্গতি তা কুন্দর চরিত্রের মধ্যে চিত্রায়িত করেছেন। অন্যদিকে বঙ্কিমবাবুর আর একটি সৃষ্টি হল 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের রোহিণী চরিত্রটি, আর চরিত্রের মূল ট্রাজেডি হল গোবিন্দলাল। প্রথমদিকে গোবিন্দলাল বিধবা রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তার স্ত্রী ভ্রমরকে তাচ্ছিল্য করে, কিন্তু গোবিন্দলালের সাথে রোহিণীর এই আকর্ষণ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। গোবিন্দলালের প্রলোভনে রোহিণী তার নৈতিকতা, সামাজিক অবস্থান, সম্মান সব বিসর্জন দিয়েছিলেন যা তাকে ট্র্যাজিক পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এবং শেষে এক কলঙ্কিত জীবনে তার যবনিকাও ভয়ঙ্কর হয়েছিল। এখানেও বঙ্কিমবাবু কুন্দনন্দিনীর মতো রোহিণীকে রূপ, যৌবন দিয়েছিলেন, সুভাগ্য দেননি।

> "রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ – রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল – শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল।"[১২]

হরলালের কথায় সে প্রথমে চুরি করতে চায়নি এ থেকে তার সততার একটা পরিচয় পাওয়া যায় –

> "চুরি ! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।"[১৩]

রোহিণীর চরিত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া বিধবা বিবাহ সম্মতির কথা, হরলালকে সে চুরি করা উইলটা দিতে চায়নি, তার বদলি সে যদি বিধবা বিবাহ করে তবেই এই উইল সে তার স্ত্রীকে দেবে, -

> "যখন আপনি বিধবা বিবাহ করিবেন, আপনার স্ত্রীকেও উইল দিব।"[১৪]

তার পরিচয় সে শুধু বিধবা নয়, সে এক প্রতিবাদী নারী চরিত্র। হরলালের দিকে চেয়ে সে উচ্চকণ্ঠে বলেছে –

> "আমি চোর! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল? ... তোমার মতো নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ না। তুমি যদি মেয়ে মানুষ হইতে, তোমাকে আজ যা দিয়া ঘর ঝাট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।"[১৫]

রোহিণীর চরিত্রটি সামাজিক প্রেক্ষাপটে আধুনিক নারীর এক ট্র্যাজিক চিত্র। যেখানে সমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণা তার জীবন পথকে করে তুলেছিল রুক্ষ ও শুষ্ক, তার ভাবনার মধ্যদিয়ে জীবনের এক করুণ আর্তি প্রজ্জ্বলিত –

> "কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোনও সুখভোগ করিতে পাইলাম না। কোন দোষে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কণ্ঠের মতো ইহজীবন কাটাইতে হইল?"[১৬]

এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনীর মতো রোহিণীকে বারংবার আত্মহত্যার পথ অনুসরণ করিয়েছেন। সামাজিক অপমানের শিকার হয়েও সে পিছপা হয়নি –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 309 - 319
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব না – কি। আর কিছু বলিবেন না এরোগের চিকিৎসা নাই – আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম। কিন্তু সে আপনার বাড়িতে নহে ... একবার ছাড়িয়া দিন কাদিয়া আসি। তারপর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয়, আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবেন।"[১৭]

গোবিন্দলালের উপেক্ষা আর ভালোবাসার অভাব রোহিণীকে গভীর মানসিক কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় –

> "এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না – না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না? আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির।"[১৮]

গোবিন্দলালের প্রতি নিজের ভালোবাসা ও সম্পর্কের কারণে তিনি সমাজের কাছে এক নষ্টা নারী হিসেবে পরিগণিত হন। যাকে সে ভালোবেসেছিল সেই গোবিন্দলাল পিস্তল দিয়ে রোহিণীকে হত্যা করল। কুন্দনন্দিনীর মতো রোহিণীর চরম পরিণতি হল বিভীষিকাময়। বঙ্কিমের এই দুটি উপন্যাস মাত্রাতিরিক্ত নীতিবোধের দ্বারা আক্রান্ত। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে যেমন স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেনি তেমনি কৃষ্ণকান্তের উইল-এ গোবিন্দলাল ভালোবাসোতে পারেনি রোহিণীকে। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ স্বপক্ষে পরাশর সংহিতা, মনু সংহিতা ও অন্যান্য শাস্ত্র থেকে বিধবাবিবাহ স্বপক্ষে জনমত গঠন করলেও বঙ্কিমচন্দ্র তা মেনে নিতে পারেনি। হয়তো, নাহলে দুটি উপন্যাসের শেষে কুন্দনন্দিনীও রোহিণীর অন্তিম পর্যায়ে এরকমভাবে সংঘটিত হতো না। কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে বঙ্কিমবাবুর ভাষায় –

> "ভ্রমণ অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমণ অপ্রাপনীয়া, রোহিণী অত্যাজ্যা – তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী শীঘ্র মরিল।"[১৯]

বঙ্কিমবাবু এই দুই বিধবা নারী চরিত্রকে এমনভাবে রূপায়িত করেছেন যেখানে সমাজের কাছে অবহেলা ছাড়া আর কিছুই তারা পায়নি। সমাজে বিধবাদের যেরকম অবস্থা ছিল সেই অবস্থা থেকে বঙ্কিমবাবু এই দুই নারী চরিত্রকে উদ্ধার করেননি বরং তাদের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত করেছেন। বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখী সম্পর্কে বলেছিল – আমি মরিব, আর তাহার সুখের কাঁটা হইয়া থাকিব না। এখানে কুন্দ সরলা কিন্তু স্বার্থপর নয়, তার জীবনের বিয়োগান্তক পরিণতির মধ্যদিয়ে সে পাঠকের অন্তরালে সজীব হয়ে থাকবে। কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী রূঢ় সামাজিক কুসংস্কারের যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া এক নারী। বঙ্কিমবাবু সামাজিক ও দাম্পত্য প্রেমে বিশ্বাসী ছিলেন বলে কুন্দ ও রোহিণীর পুনর্বিবাহ সমর্থন করতে পারেননি। রোহিণীর ভাগ্যতাড়িত জীবনের সাথে তার চঞ্চল দুঃসাহসিক পদক্ষেপও ভোগবাসনায় বঙ্কিমের রোহিণী যেন প্রথম বিদ্রোহিণী নারী। কুন্দ ও রোহিণী এই দুই নারী সমাজের কাছে চেয়েছিল নিজেদের জীবনের এক পরিচয়; বঙ্কিমবাবু উপন্যাসে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকেই তার পদস্খলনের জন্য দায়ী করা হয়। বিধবা দুই রমণীর জীবন-তৃষ্ণা, সমাজের কাছে নিজের পরিচয় চাওয়ার দাবিতে বঙ্কিমবাবু নীতিবোধের আদর্শে এই দুই বিধবা নারী জীবন তৃষ্ণাকে চিরদিনের জন্য নির্বাপিত করে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় বিধবা নারীর এক স্বতন্ত্র ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনী এবং 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিধবা নারীর প্রেক্ষিতে এক অনন্য মাত্রা দান করেছিলেন। রবির 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনী একজন অল্পবয়সী বিধবা বুদ্ধিমতী সুন্দরী এক অভিমানী নারী। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশেষ স্থান দখল করে রাখে। এখানে বিনোদিনী বিধবা হয়েও ছিলেন শিক্ষিতা এক নারী। বিনোদিনীর মা তাকে রাজলক্ষ্মীর জন্মভূমি বারাসতের গ্রাম সম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে বিনোদিনীকে বিবাহ দেন, কিন্তু কিছুদিন যাবার পর বিনোদিনী বিধবা হয়। নিজের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিসর্জন হয়। রাজলক্ষ্মীর প্রশ্নের উত্তরে বিনোদিনীর এক বক্তব্যে তা প্রকাশ পায় –

> "আমাদের দুঃখের শরীরে অসুখ করে না পিসিমা।"[২০]

এমনকি আশা ও মহেন্দ্রের প্রণয়োপাখ্যান চিঠি সে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 309 - 319
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতূকরস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাঁহার নিঃশ্বাস মরুভুমির বাতাসের মতো উতপ্ত হইয়া উঠিল।"[২১]

এখানে বিনোদিনী চরিত্রের এক অন্যধারা বিকশিত হয়েছে। বিনোদিনী স্বামী সোহাগ ভালোভাবে বুঝবার আগেই বিধবা হয়ে যায়, তার মনে থাকে এক অতৃপ্ততা। এই অতৃপ্ততার তাগিদে বিনোদিনী আশা ও মহেন্দ্রর বৈবাহিক জীবনভোগের দৃশ্য খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে।

অন্যদিক থেকে বিনোদিনীর নিপুণ কর্মদক্ষতা, ইংরেজিতে কথা বলা, তার সৌন্দর্যতায় মহেন্দ্র তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিনোদিনীর প্রতিবাদী সত্তাও ছিল প্রবল। আবার তার মধ্যে সেবাপরায়ণতার দিকটিও ফুটে উঠেছে। বিনোদিনীর মুখে কখনও শোনা যায় –

> "সংসারে আপন পর কেহই নাই। যে আপন মনে করে সেই আপন – যে পর বলিয়া জানে, সে আপন হইলেও পর।"[২২]

বিধবা বিনোদিনীর সাথে মহেন্দ্রের সমাজ অস্বীকৃত প্রেম উপন্যাসে এক অনন্য মাত্রা দিয়েছে, যেখানে মহেন্দ্রের ভালোবাসার কথায় বিনোদিনী বলে –

> "ভালোবাসা আমি জন্মবধি এত বেশী পাই নাই যে; চাইনা বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারি।"[২৩]

এখানে রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর চরিত্রটিকে নবরূপে সজ্জিত করেছেন, মহেন্দ্র ও আশার দুঃখময় জীবনের অধ্যায়টির জন্য বিনোদিনীর ভূমিকা ততটা মুখ্য নয়। অস্থিরমতি, মহেন্দ্রের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ, আমিত্ববাদই তার পরিণতির জন্য দায়ী, অন্যদিকে আশার সরলতা, পরনির্ভরতা, তার অযোগ্যতা মহেন্দ্রকে তার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, মহেন্দ্র আশার আপাত মধুর সংসারে বিনোদিনী শুধু একটি দেশলাইয়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অযোগ্য আশার কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চেয়েছিল, কারণ সারাজীবন সে যে সবকিছু হারিয়ে এসেছে, অন্যদিকে বিনোদিনীর অন্যরূপ প্রকাশিত হয়েছে বিহারীর কাছে। প্রথমে সে তাকে ঘৃণা করলেও বিহারীর কাছে নিজেকে সমর্পণের মাধ্যমে তার নারীত্ব খুঁজেছে এক আশ্রয়। এক্ষেত্রে তার চরিত্রে এক কোমল শুভ্র নারীসত্তা প্রতিফলিত হয়েছে। বিহারীর কাছে সে পেয়েছে গভীর আস্থা, মিটেছে আজন্মের প্রণয়জ্বালা, বিনোদিনীর কাশী যাবার দিনে বিহারী বলল –

> "বৌঠান, তোমার একটা কিছু চিহ্ন আমি কাছে রাখিতে চাই। ... ইংরেজের একটা প্রথা আছে, প্রিয়জনের একগুচ্ছ চুল স্মরণের জন্য রাখিয়া দেয়।"[২৪]

তৎকালীন দেশে বিধবা নারীদের যে করুণ দুর্দশা, বিনোদিনীর চরিত্রের মধ্যদিয়ে দেখানো হয়েছে, বিনোদিনী ছিল এক প্রতিবাদী উন্নত মনোস্কাসম্পন্না আধুনিক নারী। যে চিরজীবন সমাজের সমস্ত নিয়মনীতিকে তুচ্ছ করে চলেছে। উপন্যাসের শেষে বিনোদিনীর শেষ কথোপকথন –

> "একসময় তুমি আমায় ভালোবাসিয়াছিলে – এখন সুখের দিনে সেই ভালোবাসার একটুখানি আমার জন্য রাখিয়ো ভাই – আর সব ভুলিয়া যেয়ো।"[২৫]

রবির লেখনীতে 'বিধবা' বিনোদিনী এক অনন্য সত্তায় গঠিত নারী।

বঙ্কিম রবির লেখনীর ধারার মতো শরৎচন্দ্রের কলমের ধারায় 'বিধবা' নারী চরিত্র এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে 'সাবিত্রী' নারী চরিত্রটিকে একজন আদর্শ নারী হিসাবে দেখানো হয়েছে, যদিও সে বিধবা নয়। এই উপন্যাসে আরও একটি নারী চরিত্র রয়েছে কিরণময়ী। তিনি একজন বিধবা, উপেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ এক জটিল সম্পর্কের সৃষ্টি করেছিল। 'কিরণময়ী' চরিত্রটি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ এবং বুদ্ধিমান।

> "তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী কিরণময়ী স্বামীর পীড়া উপলক্ষে এই কয়টা দিন উপেন্দ্রকে ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পাইয়া তাহাকে চিনিল। ইহাতে শুধু যে তাহার স্বার্থ হানির ব্যাকুল আশঙ্কাটাই তিরোহিত হইল তাহা নহে, এই অপরিচিতের উদ্দেশ্যে একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাবে তাহার সমস্ত হৃদয় জল ভারাক্রান্ত মেঘের মতো বর্ষোন্মুখ হইয়া উঠিল। এমন লোক সে কখনও দেখে নাই।"[২৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 309 - 319
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উপেন্দ্রর প্রতি তার গোপন অনুভূতির টানকে সে উপেক্ষা করতে পারেনি। কিরণময়ী চরিত্রটি সমাজের চিরাচরিত নারী চরিত্র থেকে ভিন্ন। তার আবেগ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপন্যাসে এক অনন্য মাত্রা দান করে, এই উপন্যাসে কিরণময়ী এক বহুমাত্রিক জটিল চরিত্র, -

> "হয়ত দয়াকরে তিনি আমাকে দুটো খেতে দেবেন, কিন্তু এই পরের উপর নির্ভর করে থাকাই ত ভিক্ষে করা ঠাকুরপো।"[২৭]

তাঁর আচরণ কথাবার্তায় তিনি ছিলেন সমাজে প্রচলিত নিয়মকানুনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ততা, গভীর মনস্তাতাত্ত্বিক মনোভাব তাকে অন্যান্য থেকে স্বতন্ত্র করে। উপন্যাসে উপেন্দ্রর মতে, -

> "স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের মধ্যে মস্ত ভুল ছিল। এমন নারীও আছে, যাহার সম্মুখে পুরুষের অভ্রভেদী শির আপনি ঝুঁকিয়া পড়ে। জোর খাটে না, মাথা অবনত করিতে হয়। এমনি নারী কিরণময়ী।"[২৮]

যে সমস্যা সঙ্কুল পরিস্থিতিতে হার মানে না, মনের গভীরভাবে পতিব্রত্যের আদর্শকে ভালোবাসতেন।

> "দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে সেই যে একবাড়িতে ঢুকেছি মরণ না হলে বোধ করি আর বার হতেই পারব না।"[২৯]

উপন্যাসে তার চরিত্রে বুদ্ধিমত্তা রচনার প্রতিটি অংশে বিশ্লেষিত। তার মতে, একদিকে সমাজের ভণ্ড নিয়ম, সামাজিক নিয়মের প্রতি অবজ্ঞা –

> "যা বুদ্ধির বাইরে তাকে বুদ্ধির বাইরে বলেই ত্যাগ করব। মুখে বলব অব্যক্ত, অবোধ্য, অজ্ঞেয়, আর কাজে কথায় তাকেই ক্রমাগত বলবার চেষ্টা, জানবার চেষ্টা কিছুতেই করব না।"[৩০]

তাঁর মনে ছিল নৈতিক আদর্শ, সমাজের চোখে চরিত্রহীন হলেও তিনি ছিলেন আধুনিকা। কিরণময়ীর উক্তি –

> "ঐখানেই ত মুশকিল ঠাকুরপো, দুরকমের অন্ধ আছে কিনা! যারা চোখ বুজে চলে, তাদের সম্বন্ধে ত ভাবতে হয় না – তাদের চেনা যায়। কিন্তু যারা দু'চোখ চেয়ে চলে দেখতে পায় না, তাদের নিয়েই যত গোল। তারা নিজেরাও ঠকে, পরকেও ঠকাতে ছাড়ে না।"[৩১]

তাঁর জীবনের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটার কারণে তার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় তীব্র আত্মগ্লানি। তার চরিত্রের প্রধান বাধা তিনি এক বিধবা। তার নেই কোনো অস্তিত্ব সমাজে, এই নিয়মকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। যার জন্য তাকে অনেক মানসিক যন্ত্রণার শিকার হতে হয়েছে। তৎকালীন সমাজের নৈতিক অবক্ষয় এবং মানসিক টানাপোড়েনে 'কিরণময়ী' এক জ্বলন্ত নারী চরিত্র।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অন্নদা দিদি এক উল্লেখযোগ্য পার্শ্বচরিত্র, যিনি সর্পমোহকরের স্ত্রী এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃতা, ইন্দ্রনাথও শ্রীকান্তের প্রতি ছিল তার গভীর স্নেহ, অন্নদাদিদি পতিব্রতা নারীর আদর্শস্থল, শাহজীর অত্যাচার সে কখনও মুখফুটে কারোর কাছে বলতে চায়নি, শাহজীর আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে অন্নদাদিদি ইন্দ্রকে বলেন –

> "ইন্দ্র আমার মাথায় হাত দিয়া শপথ কর্ ভাই, আর কখনও এবাড়িতে আসিস্‌নে। আমাদের যা হবার হোক, তুই আর আমাদের কোন সংবাদ রাখিস্ নে।"[৩২]

পরবর্তী পর্যায়ে দেখি সাপের কামড়ে শাহজীর প্রাণ যায়, ইন্দ্র যখন অন্নদাদিদিকে নিয়ে যেতে চাইলেন তখন অন্নদাদিদি বললেন,-

> "এখন আমি কোথাও যেতে পারিনে ইন্দ্রনাথ। ... উনি কিছু কিছু দেনা রেখে গেছেন। সেগুলি শোধ না দেওয়া পর্যন্ত কোথাও নড়তে পারিনে।"[৩৩]

অন্নদাদিদি আর পাঁচটা সাধারণ নারীর মতো তার জীবনের বঞ্চনাকে পূর্বজন্মের সঞ্চিত পাপ হিসেবে মেনে নিয়েছে, এত দুঃখেও তার মুখে ছিল নির্মল হাসি। তাঁর চরিত্রে ফুটে উঠেছে সহনশীলতা ও পতিব্রতা, মধ্যযুগের নারী জীবনের ভয়াবহতা অন্নদাদিদির আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে পরিস্ফুট হয়। অন্নদাদিদির কথার মধ্য দিয়ে গভীর মনস্তাতাত্ত্বিক পরিলক্ষিত হয়, -

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 309 - 319
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "ওরে পাগলা, যে আমাকে আটক করে রাখবে, সে যে আমার নিজের ধর্ম। স্বামীর ঋণ যে আমার নিজেরই ঋণ। সে পাওনাদারকে তুমি কি করে বাধা দেবে ভাই।"[৩৪]

তাঁর চরিত্রে পাঠকহৃদয় মর্মস্পর্শী, অন্নদাদিদি জীবনে সুখের স্পর্শতা যেমন পায়নি, তেমনি তার চরিত্রের মধ্যে তৎকালীন সামাজিক কুসংস্কার ও বিধিনিষেধের এক প্রতিবাদী সত্তা। তাঁর চরিত্রটি তৎকালীন সমাজে সংস্কার এবং নারীর একনিষ্ঠতার প্রতীক হিসেবে প্রস্ফুটিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শৈলজা দেবী এক গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র। তিনি শিবনাথের পিসিমা এবং বিধবা নারী, যিনি তার বিধবা জীবনের একনিষ্ঠ নারী। তার চরিত্রের মধ্যদিয়ে ফুটে উঠেছে প্রভাবশালী কঠোর চরিত্র। তিনি ছিলেন পরিবারের প্রধান, তার চরিত্রের মধ্যে দাম্ভিকতা ও সাহসিকতা বর্তমান। তার মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতাময়ী প্রতিবাদী সত্তা। নিজের সীমানার জায়গায় অন্যরা দখল করতে চাইলে তিনি বলেন –

> "তুলে নিন শেকল আমার সীমানা থেকে।"[৩৫]

শৈলজা দেবী যেন প্রাচীন ও মধ্যযুগীও সামন্ত সভ্যতার প্রতীক। শৈলজা দেবী ছিলেন প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন, বৈষয়িক মনোভাব সম্পন্না। তার কথাবার্তায় সেই স্পষ্টতার ছাপ পরিলক্ষিত, রামকিঙ্করবাবুর কথায় তিনি বলেন, -

> "ব্যবসাদার কি বিনা গরজে কোথাও পা বাড়ায়। বেনেতী বুদ্ধি পেটে পেটে হয় তাদের।"[৩৬]

শৈলজা দেবী একই দিনে স্বামী পুত্রকে হারিয়ে নাবালক শিবনাথের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শৈলজা দেবীর মুখে তারাশঙ্কর বসিয়েছিলেন স্পষ্ট উক্তি, -

> "কিসের মায়া? কার মায়া? যার এক বিছানায় স্বামী পুত্র মরে, রাজার মতো ভাই মরে যায়, সে আবার মায়া করবে কার? তবে আছি শুধু তোমার জন্যে, তুমি আমার দাদার স্ত্রী, শিবুর মা, তোমার লাঞ্ছনা হবে, পাঁচজনে বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে বিদেয় করে দেবে, সেই জন্যে পড়ে আছি।"[৩৭]

জমিদারের কন্যা হিসেবে তিনি আভিজাত্যের গর্বকে অতিযত্নে লালন করতেন, নিজে বিধবা হয়েও ওপর এক বিধবা (শিবুর মা)র কষ্টকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। উপন্যাসের শেষ অংশে দেখা যায় শিবনাথের সঙ্গে তার মনোমানিল্যতা, স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শিবনাথ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, এখানে শৈলজা দেবীর উক্তি সততই অনন্য, -

> "না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত। আমি ঘাট মানতে বলতে পারব না বাবা। যদি সে অন্যায় করত, কথা ছিল। কিন্তু এতো অন্যায় নয়।"[৩৮]

শৈলজা দেবীর মধ্যে ছিল পিতৃপুরুষ ও অতীত-এর সকল গৌরব। তিনি কোনও অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি, সারাজীবন ন্যায়কে সমর্পণ করে গেছেন। উপন্যাসের শেষে পিতৃপুরুষের প্রতিভূ হিসাবে পিসিমা (শৈলজা দেবী) উপস্থিত হয়েছেন, শিবনাথ পিসিমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, -

> "সমস্ত জীবের ধাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই ব্যস্ত; সেই বাস্তব মূর্তিমতী তুমি, তোমাকে যে সে বাস্তব বংশের কল্যাণ করতেই হবে। এই তো তোমার ধর্ম। তুমিই তো আমায় বাস্তবকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে, আশীর্বাদ কর, ধরিত্রীকে চিনে যেন তোমায় চেনা শেষ করতে পারি।"[৩৯]

তারাশঙ্কর শৈলজা দেবী চরিত্রের মধ্যদিয়ে নারীর শক্তি ও স্বাধীনতার এক অন্য বার্তা দিয়েছেন, যা সমাজ তথাকথিত 'বিধবা' নামে চিহ্নিত করলেও নারীর শক্তি, সাহস কোনো অংশে কমে যায় না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বিধবা' নামাঙ্কিত নারীদের চরিত্রকে লেখনীর দ্বারা নানা অবয়বে প্রতিভাসিত করা হয়েছে। বঙ্কিমের রচনায় কখনও তারা সমাজের কলঙ্কিনী কখনও প্রতিবাদী সত্তা। বঙ্কিম তাদের পরিণতি ভয়াবহ মৃত্যুতে পর্যবসিত করেছেন। রবির কলমে তারা আধুনিকা, নবমনোস্কামনাসম্পন্না এক নারী, সমাজ তাদের গণ্ডীতে বাঁধতে চাইলেও তারা স্বাধীনচেতা শিক্ষিতা রমণী। শরতের বিধবা রমণী যেন অন্য ধারার এক চরিত্র, বুদ্ধিদীপ্তা গভীর মনস্তাতাত্ত্বিকতা সম্পন্ন নারী। তারাশঙ্করের নারী স্বাধীন, যে ন্যায়ের পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ বিভিন্ন লেখকের রচনার ধারায় নারী বিশেষত বিধবা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 309 - 319
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চরিত্রটি সমাজের বিধিনিষেধের যন্ত্রণা জ্বালায় এক নতুন রূপে ফুটে উঠেছে। সমাজে 'বিধবা' নামটি নারীর মননে, শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সে সমাজের সমস্ত সুখ, সম্পত্তি, অধিকার থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে মৃতপ্রায় অবস্থায় নিজ জীবন নির্বাহ করে, বলা হয় যে, -

"নগ্না জলহীনা নদী, নগ্ন অরাজক দেশ
বিধবা রমণী নগ্না, কী বলিব তার ক্লেশ?"[৪০]

যার স্বামী নেই তাকে হাজার কাপড় পরালেও সে নগ্ন। সমাজে নেই কোনো তার দাম। আধুনিক ভারতে বিধবা বিবাহ ১৮৫৬ সালে Hindu Widow's Remarriage Act পাস হয়েছিল, বিদ্যাসাগর বলেছেন, -

> "বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্ব প্রধান সৎকর্ম। ... এবিষয়ের জন্যে সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং অনাবশ্যক হইলেও প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাণ্মুখ নহি। কিন্তু আইন কার্যকর হওয়ার বহুকাল পরেও বিধবার বিয়ে সমাজে সহজ, স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে ওঠেনি।"[৪১]

আসলে নারী স্বাধীনতা বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে না। নারীর বৈধব্য দশা মোচন হবে নারী শিক্ষাকে প্রজ্জ্বলিত করলে। উপন্যাসের বিভিন্ন ধারায় দেখা গেছে উল্লেখ্য চরিত্র বিনোদিনী, শৈলজা, রোহিণী, কুন্দনন্দিনী, সাবিত্রী প্রমুখ চরিত্রের পরিণতি সুখকর হয়নি। তারা সারাজীবন সমাজে লাঞ্ছিতা নির্যাতিতা, নানা কষ্ট সহ্য করে গেছে, কেউ মৃত্যুকে বরণ করেছে। আবার কেউ সংসার ত্যাগী হয়েছে, অর্থাৎ সমাজের কাছে তাদের আশা আকাঙ্খার পূর্ণতা কোনোদিন সম্ভবপর হয়নি।

বাংলা সাহিত্যে পুরুষ, নারী, খলচরিত্র, পার্শ্বচরিত্রের মতো 'বিধবা' চরিত্রটি একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে। 'বিধবা' চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লেখকের লেখনী ধারার মানসিকতা ফুটে উঠেছে তাদের রচনায়। বাংলার মেয়েদের বৈধব্যের যন্ত্রণা সেকালেও ছিল একালেও আছে। আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন দেশে 'বিধবা' এখনও অপাংক্তেয়। সাহিত্যের ধারায় তাদের যে প্রতিবাদী সত্তা ধরা পড়েছে, তা তাদের সমাজের কাছে নয়, বরং নিজের কাছে নিজের স্বতন্ত্রতাকে ফুটিয়ে তুলতে। নারীর বৈধব্য যন্ত্রণা যা যৌবনবতী নারীর দুর্নিবার যৌনাবেগকে নিরসন করে আটকে রাখা। শরীরের যৌন উদ্বেল কোনো দেশ কাল মানে না, মানে না কোনো আচরণ। বৈধব্যের অসহায়তাকে কবির এক বিধবা নারীর স্বগত ভাষণে বলেছেন –

"সে সময় কত অগ্নিশিখা উদ্গিরয়,
ঋতুস্রাব কত তার দেশেচ্ছিন্ন হয়।
অমিত-অবলানারী, কত সংগোপিতে পারি,
মনোজ যাতনানল চিরভয়ঙ্কর?
যে অনলে জ্বলে সদা মম মনোবস
হে লজ্জে! সে অগ্নি কিছু নহে সাধারণ!"[৪২]

সমগ্র উনিশ শতকে শুধু উপন্যাস নয়, নাটকে, কবিতায়, প্রবন্ধে বিধবা নারীর বৈধব্য যন্ত্রণা, তাদের আশা আকাঙ্খা, কামনা বাসনা, অর্থাৎ মানবজীবনের প্রক্ষোভগত রূপগুলিকে নানাভাবে, নানা ছলে প্রকাশ করেছেন তাঁদের লেখনী ধারায়।

Reference:

১. আচার্য, দেবীদাস, 'মহাভারতে নারীজীবন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৪, পৃ. ২৫৮-২৫৯
২. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, 'বাল্যবিবাহের দোষ', বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, খণ্ড ২, সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৪৭, পৃ.৮
৩. আচার্য, দেবীদাস, 'মহাভারতে নারীজীবন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৪, পৃ. ২৬১
৪. পোদ্দার, সোমক, 'ভারতবর্ষীয় বিবাহকথা', পাঞ্চালিকা প্রকাশনী, সংস্করণ জুন ২০২৪, পৃ. ২০১

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 309 - 319
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বঙ্কিম রচনাবলী, উপন্যাসসমগ্র', তুলিকলম, সাহিত্যতীর্থ, পঞ্চদশ সংস্করণ, মে ২০০২, পৃ. ২৪৩
৬. তদেব, পৃ. ২৫২
৭. তদেব, পৃ. ২৫২
৮. তদেব, পৃ. ২৬৬
৯. তদেব, পৃ. ২৭০
১০. তদেব, পৃ. ৩২৬
১১. তদেব, পৃ. ৩২৭
১২. তদেব, পৃ. ৫৪১
১৩. তদেব, পৃ. ৫৪২
১৪. তদেব, পৃ. ৫৪৫
১৫. তদেব, পৃ. ৫৪৬
১৬. তদেব, পৃ. ৫৪৮
১৭. তদেব, পৃ. ৫৫৮
১৮. তদেব, পৃ. ৫৬১
১৯. তদেব, পৃ. ৬০৫
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী', উপন্যাস সমগ্র, পৃ. ২১৪
২১. তদেব, পৃ. ২১৬
২২. তদেব, পৃ. ২২৪
২৩. তদেব, পৃ. ২৭৫
২৪. তদেব, পৃ. ৩৬১
২৫. তদেব, পৃ. ৩৬২
২৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎ রচনাবলী, পৃ. ২৯২
২৭. তদেব, পৃ. ৩০৮
২৮. তদেব, পৃ. ৩২৭
২৯. তদেব, পৃ. ৩৩৫
৩০. তদেব, পৃ. ৩৩৮
৩১. তদেব, পৃ. ৩৪৯
৩২. তদেব, পৃ. ৪৩৪
৩৩. তদেব, পৃ. ৪৩৮
৩৪. তদেব, পৃ. ৪৩৮
৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'ধাত্রীদেবতা', বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৭ম মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৬৫, পৃ. ১৩
৩৬. তদেব, পৃ. ১৭
৩৭. তদেব, পৃ. ৩০
৩৮. তদেব, পৃ. ৩৮১
৩৯. তদেব, পৃ. ৩৮৬
৪০. আচার্য, দেবিদাস, 'মহাভারতে নারীজীবন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৭ম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ২০২৪, পৃ. ২৭৫
৪১. তদেব, পৃ. ২৭৭

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 41
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 309 - 319
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৪২. বিধবা বাঙ্গাঙ্গনা, বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা, হরিশচন্দ্র মিত্র, ঢাকা সুলভ প্রেস, ৩০ শে বৈশাখ ১২৭০, পৃ.৬

Bibliography:

মিত্র, উমেশচন্দ্র, 'বিধবা বিবাহ নাটক', বাংলা নাট্যসংকলন, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, সম্পাদনা বিষ্ণু বসু ও নৃপেন্দ্র সাহা, জুন ২০০১

মিত্র, রাধামাধব, 'বিধবা মনোরঞ্জন', শ্রীনবীনচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রকাশিত, ১৭৭৯ শকাব্দ, কলকাতা

মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র, 'বিধবার দাঁতেমিশি', কলিকাতা, সূর্যপাড়ালেন, সিমলা ১৮৭৪

গঙ্গোপাধ্যায়, গঙ্গেশচন্দ্র, 'বিবাহ ও সমাজ', নব্যভারত, মাসিকপত্র ও সমালোচনা, শ্রীদেবী প্রসন্নরায় চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয়, অষ্টম খণ্ড শ্রাবণ ১২৯৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, 'বিধবা রমণী', হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জ্যেষ্ঠ, প্রথম সংস্করণ ১৩৬১

ঘোষ, বিনয়, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালিসমাজ', সমাচার সুধাবর্ষণ, ১২ নভেম্বর ১৮৫৫

রায়, শিবনাথ, 'বিধবা বিবাহ নিষেধব্যবস্থা', কলিকাতা, ভাস্কর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত, ইং ১৮৫৫

ঘোষ, বিনয়, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালিসমাজ' Bengal spectator, voll, No. 1, April 1842, ভাদ্র ১৩৩৬

শর্মা, গোবিন্দচন্দ্র, 'বিধবাবিবাহ নিষেধবিষয়ক ব্যবস্থা', ১৭৬৭ শকাব্দ

চট্টোপাধ্যায়, উমাচরণ 'বিধবোদ্বাহ', কলিকাতা, অনুবাদ প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত, ১৭৭৮ শকাব্দ

চক্রবর্তী, ঈশিতা, চক্রবর্তী দীপিতা, 'বাংলার মেয়েদের শ্রম, বিবাহ ও বৈধব্য', দেশভাগের আগে-পরে, আশাদীপ, মে ২০২৪